35/40

Dwagne 27.6.23

PROJECT OF HISTORY :2023

ARCHITECTURE OF THE MIDIEVAL CITY OF GOUR A REVIEW

SUBMITTED BY

MUNNA SARKAR

SEMESTER- VI. PAPER- SEC-2

ROLL-0720HISH NO-0149

REGISTRATION NO-071-1111-0149-20

SESSION-2020-2021

SUPERVISED BY

ANIRUDDHA MAITRA

ASSISTANT PROFESSOR

DEWANA ABDUL GANI COLLEGE

HARIRAMPUR.DAKSHIN DINAJPUR

Scanned with OKEN Scanner

(সূচিপত্র)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

1. ভূমিকা
2. গৌড়ের স্থাপত্য শিল্পের একটি সামগ্রিক ধারণা
3. স্থাপত্য শিল্পের বিবরণ
    a. মসজিদ
    b. তোরণ
    c. প্রতিরক্ষা প্রাচীর
4. উপসংহার
5. ম্যাপ, চিত্রাবলী

Scanned with OKEN Scanner

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:-

আমি সর্বাঙ্গীনভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-অধ্যাপক ছহির আলী মিয়া, অনিরুদ্ধ মৈত্র, মোকলেসুর রহমান ও রিয়াজুল হক মহাশয় প্রত্যেকের কাছেই কৃতজ্ঞ যাদের ছাড়া এই প্রকল্প রূপায়ণ সম্ভব ছিলনা।

Scanned with OKEN Scanner

গ্রন্থ তালিকা:-

প্রকল্পটির রূপায়নের জন্য মূলত মালদা জেলার গৌর রাজ্য পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন গাইড এর লেখা বই, তৎকালীন পর্যটক এর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ, শিক্ষকদের গৌড় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বইয়ের সহযোগিতা এবং ইন্টারনেট থেকে বের করা তথ্য সূত্র ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেছ।

মহেন্দ্র পালের জগজ্জীবনপুর তাম্র শাসন -মালদা জেলার

1. মালদা জেলার ইতিহাস: - (প্রদ্যোত ঘোষ)
2. গৌড় ও পান্ডুয়ার স্মৃতি:- (খান সাহেব আবিদ আলী খান)
    i. সংশোধন ও সম্পাদনা:- (এইচ . ই. স্টেপলটন)
    ii. বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা:- (চৌধুরী শামসুর রহমান)

ভূমিকা:-

আমরা দেওয়ান আব্দুল গনি কলেজ বি.এ তৃতীয় বর্ষের vi সেমিস্টারের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের সিলেবাসের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ভ্রমণ প্রকল্পকে সম্পূর্ণ করার জন্য ঐতিহাসিক স্থান মালদা জেলার অন্যতম দর্শনীয় স্থান গৌর কে বেছে নিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ইতিহাস বিভাগের স্যারদের সহায়তায় ২০/০৫/২৩ তারিখে গৌড় রাজ্যের স্থাপত্য গুলি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পৌঁছালাম। গৌড় রাজ্যে প্রবেশ করার পর আমরা রামকেলি থেকে নিয়ে কোতোয়ালি দরওয়াজা পর্যন্ত যতগুলি মসজিদ এবং স্থাপত্য আছে তার সবগুলোই পরিদর্শন করলাম এই গৌর রাজ্যের স্থাপত্য নিয়ে আমি একটি প্রকল্প রচনা করব। আমার প্রকল্পের নাম হল 'গৌড়ের স্থাপত্য শিল্প; একটি পর্যালোচনা'।

গৌড় বাংলার মধ্যযুগীয় রাজধানী এবং অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত যার অবস্থান বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এটি লক্ষণাবতি বা লক্ষনৌতি নামেও পরিচিত প্রাচীন এই দুর্গ নগরীর অধিকাংশ পড়েছে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদা জেলায়। এবং কিছু অংশ পড়েছে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। শহরটির অবস্থান ছিল গঙ্গা নদীর পূর্ব পাড়ে রাজমহল থেকে ৪০ কি. মি ভাটিতে এক মালদার ১২ কি. মি দক্ষিণে। তবে গঙ্গানদির বর্তমান প্রবাহ গৌড় এর ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক দূরে।

গৌড় প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধশালী জনপদ। তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় তার পোড়ামাটি ও লাল ইটের স্থাপত্য ের রংবেরঙের মিনা করা টালির কাজ ধরে রেখেছে কয়েকশো বছরের সময়ের স্মৃতি। বহু রাজবংশের উত্থান পতনের নিরব সাক্ষী গৌড় আজ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে খানিকটা দুয়োরানির আসনে সময়ের ঝড়ে আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগের জৌলুষ হারিয়েছে অনেকটাই। তবুও ইতিহাসের টানে প্রতিবছরই দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর মানুষ আসেন গৌড় ভ্রমনে। শোনা যায় একসময় গুড়ের ব্যবসার জন্য এই জনপদ ছিল বিখ্যাত আর সেই থেকেই গৌড় নামটা এসেছে। আবার পুরান বলে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন সেখান থেকেই এই নামকরণ।

ঐতিহ্যবাহী এই জনপদের বেশিরভাগ অংশ এখন পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার অন্তর্গত, বাকি অংশ পড়েছে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। গৌড়ের অবস্থান ছিল এখনকার মালদা জেলার দক্ষিণে গঙ্গা ও মহানন্দা নদীর মাঝখানে। প্রায় কুড়ি মাইল লম্বা ও চার মাইলপ্রস্থ নিয়ে গড়ে ওঠা সেকালের গৌরনগরের প্রবেশের মূল

Scanned with OKEN Scanner

স্থরণটি পরিচিত ছিল কোতোয়ালি দরওয়াজা নামে যা এখন ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানার সীমান্তবর্তী চেকপোস্ট।

সেন শাসনামলে লক্ষনাবতী বা লখনৌতি উন্নতি লাভ করে। লক্ষনাবতী নগরের নামকরণ করা হয়েছে সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন - এর নামানুসারে। সেন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের আগে গৌড় অঞ্চলটি পাল সাম্রাজ্যের অধীনের ছিল এবং সম্ভবতঃ রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল এর প্রশাসনিক কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ শহর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় ও পান্ডুয়া (প্রাচীন নাম গৌড়নগর ও পান্ডুনগর)। [২] অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ যুগে পাল বংশের রাজাদের সময় থেকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ১১৯৮ সালে মুসলমান শাসকেরা গৌড় অধিকার করবার পরেও গৌড়েই বাংলার রাজধানী থেকে যায়। ১৩৫০ থেকে রাজধানী কিছুদিনের জন্য পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হলেও ১৪৫৩ সালে আবার রাজধানী ফিরে আসে গৌড়ে, এবং গৌড়ের নামকরণ হয় জান্নাতাবাদ।[

Scanned with OKEN Scanner

গৌড়ের স্থাপত্য শিল্পের একটি ধারণা:-

_______________মালদাহ/মালদা এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় নামটি এসে যায় । এই নামটি সর্ব জনমান্য ব্যাখ্যা নেই। পুন্ড্র বর্ধন আধুনিক পান্ডুয়া বরেন্দ্রভূমির একটি বিশিষ্ট স্থানের নাম। তবে সমগ্র উত্তরা পথের এক ব্যাপক নাম গৌড় খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ পরাশর খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গৌর রাজ্যে উল্লেখ করেছে। কলহনের রাজতরঙ্গিনী তে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে গৌড় নামক ভূখন্ডে রাজধানীর নাম ছিল পুন্ড্র বর্ধন। গৌড় বা গৌড় দেশের অবস্থান যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, তবে বর্তমান মালদা জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় মহানগরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি আজও তার স্মৃতি ও নিদর্শন বহন করেন। তাই মোটামুটি এই জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের কিয়াংশ নিয়েই প্রাচীন গৌড় রাজ্য প্রথমে গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।।

গৌড় বাংলার মধ্যযুগীয় রাজধানী এবং অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি নগর যার অবস্থান বর্তমান ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এটি লক্ষণাবতী নামেও পরিচিত। সেম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের আগে গৌর অঞ্চলটি পাল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল এবং সম্ভবত রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল এর প্রশাসনিক কেন্দ্র। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ যুগে পাল বংশের রাজাদের সময় থেকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ১১৯৮ সালে মুসলমান শাসকেরা গৌড় অধিকার করার পরেও গৌড় ই বাংলার রাজধানী থেকে যায়। অনুমান করা হয় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে এটি বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর হিসেবে পরিচিত ছিল।

গৌড়ে স্থাপত্য কীর্তি গুলির মধ্যে বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারি সবথেকে বড়। এর উচ্চতা ২০ ফুট, দৈর্ঘ্য 168, প্রস্থ 76 ফুট। গৌড় দুর্গে প্রবেশের প্রধান তার দাখিল দরওয়াজা। এই দরজার দুপাশ থেকে ধনী করে সুলতান ও উদ্বোধন রাজ পুরুষের সম্মান প্রদর্শন করা হতো। কোতোয়ালি দরওয়াজা থেকে এক কিলোমিটার উত্তরই রয়েছে লোটন মসজিদ। ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার শাহ সুজা গৌড় দুর্গে প্রবেশ করার জন্য লুকোচুরি দরজাটি তৈরি করেন। লুকোচুরি দারওয়াজা দিয়ে গৌড় দুর্গে ঢোকার পর ডান দিকে রয়েছে কদম রসুল সৌধ। এক গম্বুজ বিশিষ্ট চিকা মসজিদের স্থাপতি ১৪৫০ সালে তৈরি। কথিত আছে সম্রাট হোসেন শহর এটিকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন। স্থাপত্যটির ভিতরের দেয়ালে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে

Scanned with OKEN Scanner

স্থাপত্য শিল্পের বিবরণ-

1) বারদুয়ারি বা বড় সোনা মসজিদ:-

গৌড়ের সৌধগুলোর মধ্যে অন্যতম ১২ দুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ। প্রায় বারোমিটার উঁচু, দৈর্ঘ্য প্রস্থের বিশালাকার (মিটার×২২.৮ মিটার) এই মসজিদ তৈরি শুরু হয় আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে, শেষ করেন তার পুত্র নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ ১৫২৬ সালে। নাম বারদুয়ারি হলেও এর দুয়ার বা দরজা আসলে এগারোটা। শোনা যায়, বাদশা আসতেন এই মসজিদে নামাজ পড়তে। ইন্দো আরবি ও শৈলীর মিশ্রণে তৈরি এই মসজিদ নির্মাণ শুরু হয় ইট দিয়ে, পূর্ণতাপায় পাথরের কাজে। ৪৪ টা গম্বুজের মধ্যে মাত্র ১১ টা এখন টিকে আছে। গম্বুজের সোনালী চিকন কাজের জন্য একে সোনামসজিদ বলে, আর আকৃতির বিশালত্তের জন্য নাম বড় সোনা মসজিদ।

ক্যানিং হাম এর বক্তব্যে জানা যায় যে, ফ্রাঙ্কলিন সোনার মত দামি অর্থাৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় এটি নির্মিত বলে এটির নাম সোনামসজিদ। আবিদ আলীও এ যুক্তি সমর্থন করেছেন। আবার কেউ কেউ সোনার পাতে মোড়া -এমন হাস্যকর যুক্তিও দেখিয়েছেন। মসজিদের সোনার কাজের ব্যবহার থাকার কথা নয়। সোনালী রঙের ব্যবহার ও প্রাথমিক পর্বে ছিল না। সবুজ, বেগুনি রং সোনালি বা রেশমির পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো। উজ্জলের স্বর্ণময় ছিল বলে এটি সোনা মসজিদ নামে অভিহিত। এমন মনে করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া বারদুয়ারি নামটি ও বিতর্কিত। ১২ টি দরজার জন্য বারো দুয়ারী এমন অর্থ যথার্থ নয়-কারণ এখানে ১১ টি প্রবেশদ্বার আছে। আবিদ আলী এটিকে জনকক্ষ (audience hall) বলেছেন। এটি যথার্থ প্রকৃতপক্ষে রাজপ্রাসাদের বহির দেশে এর অবস্থা বলে এটি বারদুয়ারি।

2) কদম রসুল মসজিদ:-

________________ফিরোজ মিনার থেকে প্রায় এক দুই কিমি দক্ষিনে বিশাল গড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বাম পাশে কদমে রাসূল ভবন বা কদম শরীফ। সাদা পাথরের উপর নবী হযরত মুহাম্মদের পবিত্র পদচিহ্ন এই ভবনের মধ্যে সংরক্ষিত।। এটি অবশ্য হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয়। ভবনটির সম্মুখভাগ বাংলার বাঁকুড়া বীরভূম হুগলির অনেক মন্দির তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত দিনাজপুরের কাঞ্চনগড় ইত্যাদি মন্দিরের কথায়

Scanned with OKEN Scanner

মনে পড়ায়। সুতরাং এটি মন্দির থেকে এই ভবনে পরিবর্তনের সম্ভাবনাই প্রবল। ভবনটি ৯৩৭ হিজরিতে অর্থাৎ ১৫৩১ সালে সুলতান নুসরত শাহ কর্তৃক নির্মিত।

রসূল অর্থাৎ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদের কদম বা পায়ের চিহ্ন ধরে রেখেছে এই মসজিদ। জনশ্রুতি মদিনা থেকে হযরত মুহাম্মদ এর পায়ের ছাপ নিয়ে এসেছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। মসজিদের চার কোণে চারটে কালো মার্বেলের মিনার রয়েছে। এই মসজিদের উল্টো দিকে রয়েছে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি দেলোয়ারের ছেলে ফতে খাঁ এর সমাধি। আশ্চর্যজনকভাবে সেই সমাধি হিন্দু নির্মাণ শৈলী দো চালার ঢঙে তৈরি।

3) <u>চিকা বা চামকান মসজিদ:</u>

____________________১৪৭৫ সালের সুলতান ইউসুফ শাহের তৈরি এক গম্বুজ ওয়ালা মসজিদ চিকা মসজিদ। শোনা যায় এক সময়ে বিপুলসংখ্যক চিকা বা বাদুড় বাস ছিল এইখানে আর সেখান থেকেই এই নাম। চাকচিক্য ময় অলংকারনের জন্য চারখানা নামেও পরিচিতি ছিল এই মসজিদের। অনেক হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় এর অলংকরণে। একসময় চৈতন্য প্রীতির জন্য রূপ ও সনাতনকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল এখানে। পরে অবশ্য কারারক্ষীর সাহায্যে এখান থেকে পালিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে রূপ সনাতন চলে যান চৈতন্যদেবের কাছে ।

4) <u>তাঁতি পাড়া মসজিদ:</u>

তাতিপাড়া মসজিদ পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় মাটির দেয়াল ঘেরা নগরী গৌড়ের দক্ষিনে লোটন মসজিদ এবং উত্তরের ছোট সাগরদিঘির মধ্যবর্তী স্থান অবস্থিত। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইউসুফ সাহেবের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিরসাদ খান নির্মাণ করেন। বিশাল আকৃতির এ মসজিদ বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। বাইরের দিকের কোনগুলিতে চারটি বৃহৎ অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ সহ বহিরাগে

Scanned with OKEN Scanner

এর আয়তন উত্তর দক্ষিণে ২৮.৬৫ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩. ৪১ মিটার। মসজিদে প্রবেশ করতে পূর্ব দিকের সম্মুখ ভাবে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি করে খিলান নির্মিত প্রবেশপথ ছিল। অভ্যন্তরস্থ পশ্চিম দেয়াল প্রবেশ পথের মুখোমুখি পাঁচটি অর্ধবৃত্তাকার মিহরাব কুলুঙ্গি দ্বারা সজ্জিত। মসজিদটির ২৩.৭৭ মিটার ও ৯.৪৫ মিটার আয়তনে অভ্যন্তর ভাগ পাঁচটি বে এবং চারটি প্রস্তর স্তম্ভের একটি শাড়ি দ্বারা দুটি লম্বালম্বি আইলে বিভক্ত। ফলে মসজিদের ভেতরে তৈরি হয়েছিল দশটি স্বতন্ত্র বর্গক্ষেত্র। প্রতিটি বে এর উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করে ছাদ আবৃত করা হয়েছে। প্রস্তর স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত পরস্পর ছেদ কারী খিলান এবং মেহরাবের উপরের বদ্ধ খেলান গম্বুজ গুলিকে ধারণ করে আছে। গম্বুজের উত্তরণ পর্যায় বাংলা পেন্দেন্টিভ রীতিতে নির্মিত, যার প্রমাণ এখনো মসজিদের ভেতরে উপরের কোনে দেখা যায়। সুষমা মন্ডিত অলংকার এবং স্থাপতি বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রের কারণে পাঁতীপাড়া মসজিদ গৌড়ের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর স্থাপত্য কর্ম বলে বিবেচিত হয়।

5) **<u>লোটন মসজিদ:-</u>**

____________লোটন মসজিদ পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় অবস্থিত একটি সুলতানি মসজিদ। এর অবস্থান তাঁতীপাড়া মসজিদ এবং পাঁচখিলান বিশিষ্ট সেতুর মধ্যবর্তী স্থান। এটি প্রাচীন সংরক্ষিত নগরী গৌর এর স্থাপত্য নিদর্শন এর অন্যতম। মসজিদটি ১৫ শতকের শেষে অথবা ১৬ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। সম্ভবত এটি হোসেন শাহী আমলের একটি ইমারত। সম্পূর্ণভাবে ইট দাঁড়ানের মৃত এ ইমারতের অভ্যন্তরে প্রতিপার্শ্বে ১০.৩৬ মিটার আয়তনের একটি বর্গাকার নামাজ ঘর এবং ১০.৩৬ মিটার x ৩.৩৫ মিটার আয়তনের একটি বারান্দা রয়েছে, যা মসজিদ টিকে পূর্ব পশ্চিমে ২১.৯৫ মিটার এবং উত্তর দক্ষিণে ১৫.৫৪ মিটার আয়তনের আয়তাকার রূপ দিয়েছে। নামাজ ঘরের কিবলা দেয়ার ব্যতীত প্রতি পাশেই তিনটি খিলান দ্বারা নির্মিত প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব কলঙ্গী রয়েছে যা পূর্ব দিকের তিনটি প্রবেশপথের মুখোমুখি করে নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মেহরাব ও কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ সব দিক দিয়েই পার্শ্ববর্তী গুলি থেকে বড়। কেন্দ্রীয় মেহরাব টি বাইরের দিকে একটি আয়তাকার অভিক্ষিপ্ত প্রেমের মধ্যে স্থাপিত, যা স্থির তলা কলাম দিয়ে আবদ্ধ।

পূর্ব দিকের সম্মুখভাগের তিনটি প্রবেশ পথের অন্তর্বর্তী অংশ উলম্ব প্যানেল দ্বারা সজ্জিত। প্রতিটি প্যানেলে সুন্দর কুলুঙ্গি রয়েছে যাতে অলংকৃত স্তম্ভের উপর বহু খাঁজ বিশিষ্ট

Scanned with OKEN Scanner

খিলানের প্রতিকৃতি রয়েছে। নামাজ ঘরের উপরে নির্মিত গম্বুজের ড্রামের বাইরের দিকবদ্ধ লোনের একটি সারি দ্বারা সজ্জিত। গম্বুজ এর অভ্যন্তর ভাগ আটটি রিব দ্বারা নকশা করা। এগুলির মধ্যবর্তী স্থান ঝুলন্ত মতিফ দ্বারা একের পর এক সুচারুরূপে নকশা করা এবং চূড়া প্রস্ফুটিত পদ্ম দ্বারা সুন্দরভাবে অলংকৃত।। অলংকরণের বেশিরভাগ অংশই ঈদতো ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে খুব সামান্য বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় মেহরাবে অলংকরণ এখনো বিদ্যমান।

6) <u>দাখিল দরওয়াজা:-</u>

______________ফরাসি শব্দ দাখিল এর অর্থ প্রবেশ। পরিখা দিয়ে ঘেরা প্রাচীর বেষ্টিত প্রাসাদের প্রবেশের মূল দার বা দরজা ছিল দাখিল দরওয়াজা। পোড়ামাটি ও লাল ইটের অসাধারণ কাজের জন্য দাখিল দারওয়াজাকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। **The Cambridge history of India**। ১৪২৫ সালে এই দাখিল দরওয়াজা তৈরি। সম্ভবত একসময় এখান থেকে তোপ দেগে সেলাম জানানো হতো গণমান্য ব্যক্তিদের। তাই এর আর এক নাম সালামি দরওয়াজা

7) <u>লুকোচুরিগেট বা লক্ষ ছিপি দরজা:-</u>

কদমরেশন মসজিদের দক্ষিণ-পূর্বের লক্ষ্য জিপি দরওয়াজা বা লুকোচুরিদের অবস্থিত। শাহ সুজা ১৬০৫৫ সালে মুঘল স্থাপত্য শৈলীতে এটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সুলতান তার বেগমদের সাথে লুকোচুরি করার রাজকীয় খেলা থেকে এই নামের উৎপত্তি। ইতিহাসবিদদের অন্য কোন স্কুলের মতে, এটি ১৫২২ সালে আলাউদ্দিন হোসেন সহ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকে অবস্থিত, এই দ্বিতল দরওয়াজাটি প্রাসাদের প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে উদ্ভাবনী স্থাপত্য শৈলী এটিকে দেখার জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান করে তোলে।

__ সুলতান তার বেগম দের সাথে লুকোচুরি খেলতেন এইখানে। এই দরোজা কে নির্মাণ করেছিলেন সে নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। গরিষ্ঠ মত বলে ১৬৫৫ সালের শাহ সুজার সময় লুকোচুরি গেট তৈরি মতান্তরে ১৫২২ সালে হোসেন শাহ এর নির্মাতা।

Scanned with OKEN Scanner

8) <u>ঘুমটি দরওয়াজা:-</u>

______________চিকা ভবনের সামান্য দূরে পূর্ব দিকে গুমটি দারওয়াজা বা গুমটি গেট। শব্দটি ফরাসি শব্দ গুম বদ থেকে হিন্দির মাধ্যমে যাতে। এর অর্থ এক দুয়ারী ক্ষুদ্র ঘর বা প্রহরীর কুটির। সুতরাং অনেকে দুর্গানগর এর মধ্যে প্রবেশ করার গোপন পথ বলেছেন তা সঠিক নয় বলে মনে হয়।

9) <u>কোতোয়ালি দরওয়াজা:-</u>

কোতোয়ালী দরওয়াজা নগর পুলিশ প্রধান এর ফারসি প্রতিশব্দ কোতোয়াল যার অনুকরণে নামকরণ করা হয়েছে কোতোয়ালি দরওয়াজা। এ নগর পুলিশ প্রধান কোতোয়াল গৌর নগরীর দক্ষিণ দেওয়াল রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে এ প্রবেশদ্বারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং এর সঠিক বর্ণনা দেওয়া দুরুহ ব্যাপার। আবিদ আলীর বর্ণনা অনুযায়ী **memorize of Gour and pandua Calcutta 1931,** প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী খিলানের উচ্চতা 9.15 মিটার এবং প্রস্থ 5.10 মিটার। তার বিবরণে প্রবেশ পথের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের সাতছিদ্র প্রাচীরের কথা উল্লেখ আছে। এই ছিদ্রগুলি দিয়ে শত্রুর ওপর গুলি বা তীর ছড়া হতো। আবিদ আলীর মতে অভ্যন্তর ও বহির্বাগ উভয় পারস এর সম্মুখ ভাবে ক্রমডাল বিশিষ্ট অর্ধ বৃত্তাকার বুরুজ ছিল।

বর্তমানে সারিবদ্ধ থর ছিদ্র সম্বলিত বিশাল বিশাল উত্তাল পরিলেখ সহ বহিঃস্থ বুরুজের আংশিক দেখা যায়।। বরুজ গুলির পাশের প্রতিরক্ষা প্রাচীর এখনো বিদ্যমান এবং তা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম প্রাচীরটি নদী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে আর পূর্ব প্রাচীরটি ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে কিছুদূর গিয়ে পৌঁছেছে। এরপর এ প্রাচীর বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তরা বিমুখী হয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। পুরো মাটির দেয়াল থেকেই বোঝা যায় নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তখন কত মজবুত ছিল। প্রবেশ পথের খিলানগুলির ভেতর ও বাহিরে উভয় পাশে কারুকার্যমন্ডিত প্যানেলে সবিত এবং প্যানেলের অভ্যন্তরে আছে ঝুলন্ত মোটিফ। এসব প্যানেলের কিছু কিছু এখনো টিকে আছে। তবে খুব শীঘ্রই হয়তো এগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বর্তমানে কোতোয়ালি দরওয়াজা ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত রেখায় অবস্থিত। ফলে স্থানটি বেশ জনাকীর্ণ এবং স্থাপত্য কীর্তির উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব অবসম্ভাবী।

Scanned with OKEN Scanner

10) **রামকেলি:-**

পিয়াস বাড়ি থেকে ডান দিকে রামকেলি গৌড় প্রবেশের পর প্রায়ই আধ কিলোমিটার দূরে পথের ডান দিকে তামালতলা ও তার পশ্চাতে মদনমোহন জিউর মন্দির। কথিত আছে যে রামকেলিতে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপ ও সনাতন শ্রী চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী পূর্বে রাজ কাজ ত্যাগ করে বৃন্দাবনের স্বর গোস্বামীদের অন্যতম হন। রুপ ছিলেন'সগির মালিক'অর্থাৎ প্রতিরাজ এবং সনাতন ছিলেন দবির ঘাস অর্থাৎ প্রধান মুন্সি। তামাল বৃক্ষ ও চৈতন্য পদচিহ্ন পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বের শ্রীচৈতন্যের সেই শুভ পদার্পণের স্মৃতিতে রেখে এখানে জৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে রামকেলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।। বর্তমানে মদনমোহন জিউর মন্দির এর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৯৩৮ সালে নতুন ভাবে সংস্কার করে নির্মিত। শ্রী সনাতন গোস্বামী কর্তৃক শ্রী মদনমোহন ও রাধারানীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাল। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ বলে কথিত।। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, শব্দ তত্ত্বের দিক থেকে রামকেলি স্থানটিতে উৎকৃষ্ট কলা গাছ ছিল বলে এই নাম 'রম্ভা কদলী' হওয়া সম্ভব। ষোড়শ শতকে শব্দটির সন্ধান মিলে।

11) **ফিরোজ মিনার:-**

গৌড়ের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ দিল্লির কুতুব মিনারের আদলে তৈরি ফিরোজ মিনার। হাবসি সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ তার গৌড় বিজয়ের স্মারক হিসাবে ১৪৮৫ থেকে ১৪৮৯ এই পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে এই মিনার নির্মাণ করেছিলেন। তুঘলকি স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি ৮৪ সংঘ প্যাচ সিড়ি বিশিষ্ট ৫ তলা এই মিনার পীর আসা মিনার বা চিরাগ দানি নামে পরিচিত। কথিত আছে, মিনার নির্মাণের পরে স্থপতি পিরুকে মিনারের ওপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়।

Scanned with OKEN Scanner

উপসংহার:-

ইতিহাসের খোঁজে আসা পর্যটকেরা আশেপাশে ঘুরে দেখে নিতে পারেন তাতিপাড়া মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, লোটন মসজিদ, গুণ মন তো মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, কোতোয়ালি দারওয়াজা,। শোনা যায় এই কোতোয়ালি দরওয়াজা দিয়েই নাকি বক্তিয়ার খলজি গৌড়ে প্রবেশ করেন।

গৌড় প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধশালী জনপদ। তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় তার পোড়ামাটি ও লাল ইতের স্থাপত্য ের রংবেরঙের মিনা করা টালির কাজে ধরে রেখেছে কয়েকশো বছরের সময়ের স্মৃতি। বহু রাজবংশের উত্থান পতনের নিরব সাক্ষী গৌড় আজ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে খানিকটা দুয়োরানির আসনে সময়ের ঝড়ে আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আগের জৌলুষ হারিয়ে হারিয়েছে অনেকটাই। তবুও ইতিহাসের টানে প্রতিবছরই দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর মানুষ আসেন গৌড় ভ্রমনে। শোনা যায় একসময় গুড়ের ব্যবসার জন্য এই জনপদ ছিল বিখ্যাত আর সেই থেকেই গৌড় নামটা এসেছে। আবার পুরান বলে সূর্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন সেখান থেকেই এই নামকরণ।

সেন শাসনামলে লক্ষনাবতী বা লখনৌতি উন্নতি লাভ করে।লক্ষনাবতী নগরের নামকরণ করা হয়েছে সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন - এর নামানুসারে। সেন সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের আগে গৌড় অঞ্চলটি পাল সাম্রাজ্যের অধীনের ছিল এবং সম্ভবতঃ রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল এর প্রশাসনিক কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ শহর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় ও পান্ডুয়া (প্রাচীন নাম গৌড়নগর ও পান্ডুনগর)।[১] অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ যুগে পাল বংশের রাজাদের সময় থেকে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ১১৯৮ সালে মুসলমান শাসকেরা গৌড় অধিকার করবার পরেও গৌড়েই বাংলার রাজধানী থেকে যায়। ১৩৫০ থেকে রাজধানী কিছুদিনের জন্য পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হলেও ১৪৫৩ সালে আবার রাজধানী ফিরে আসে গৌড়ে, এবং গৌড়ের নামকরণ হয় জান্নাতাবাদ।[

চিত্রসূচি

চিত্র নং 1-	বারদুয়ারি বা বড় সোনা মসজিদ
চিত্রনং 2-	কদম রসুল মসজিদ
চিত্র নং 3-	চিকা বা চামকান মসজিদ
চিত্র নং 4-	তাঁতীপাড়া মসজিদ
চিত্র নং 5-	লোটন মসজিদ
চিত্র নং 6-	দাখিল দরওয়াজা
চিত্র নং 7-	লুকোচুরি গেট বা লক্ষ ছিপি গেট
চিত্র নং 8-	গুমটি দরওয়াজা
চিত্র নং 9-	কোতোয়ালি দরওয়াজা
চিত্র নং 10-	রামকেলি
চিত্র নং 11-	ফিরোজ মিনার

Scanned with OKEN Scanner

চিত্র নং, 1 (বারদুয়ারি বা বড় সোনা মসজিদ)।

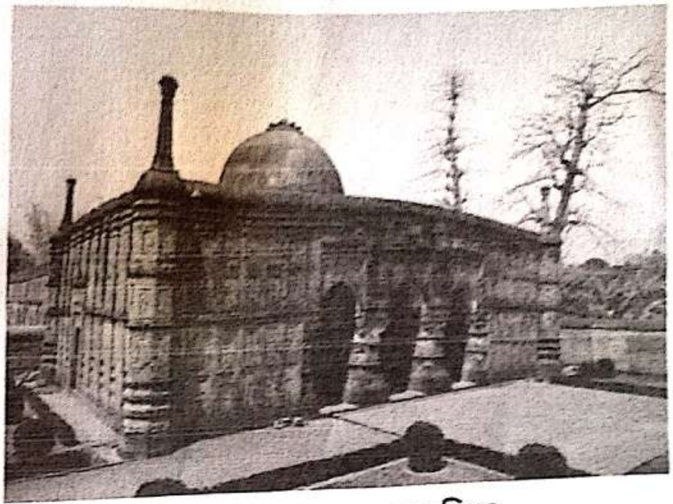

চিত্র নং ,2 (কদম রসুল মসজিদ)

চিত্র নং,3(চিকা বা চমকান মসজিদ)।

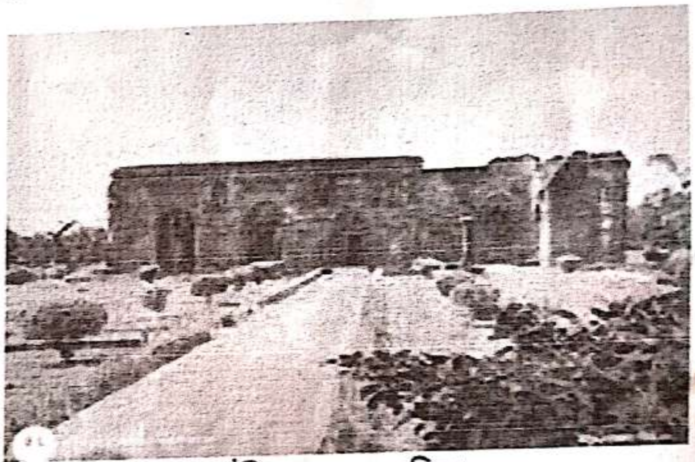

চিত্রনং,4 (তাঁতি পাড়া মসজিদ)

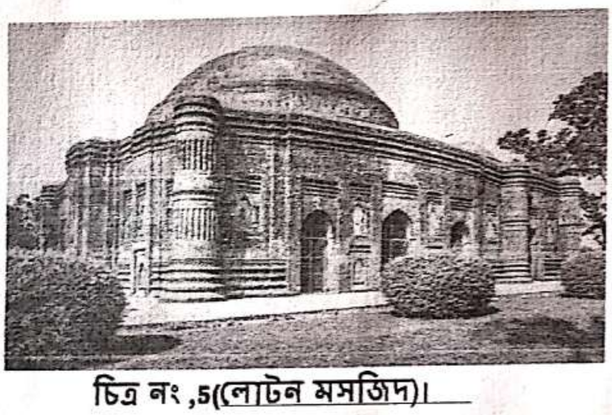

চিত্র নং ,5(লোটন মসজিদ)।

চিত্র নং, 6 (দাখিল দারওয়াজা)

Scanned with OKEN Scanner

চিত্র নং, 7(লুকোচুবি গেট বা লক্ষ ছিপি দরওয়াজা)

চিত্র নং, ৪ (গুমতি দরওয়াজা)

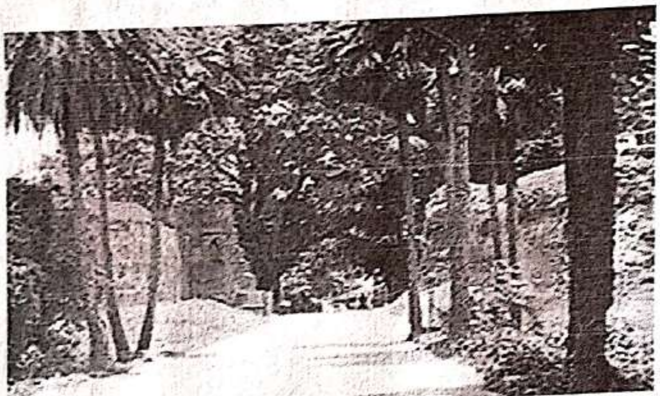

চিত্র নং, 9(কোতোয়ালি দরওয়াজা)।

চিত্র নং 10 (রামকেলি)

চিত্র নং, 11 (ফিরোজ মিনার)

Scanned with OKEN Scanner

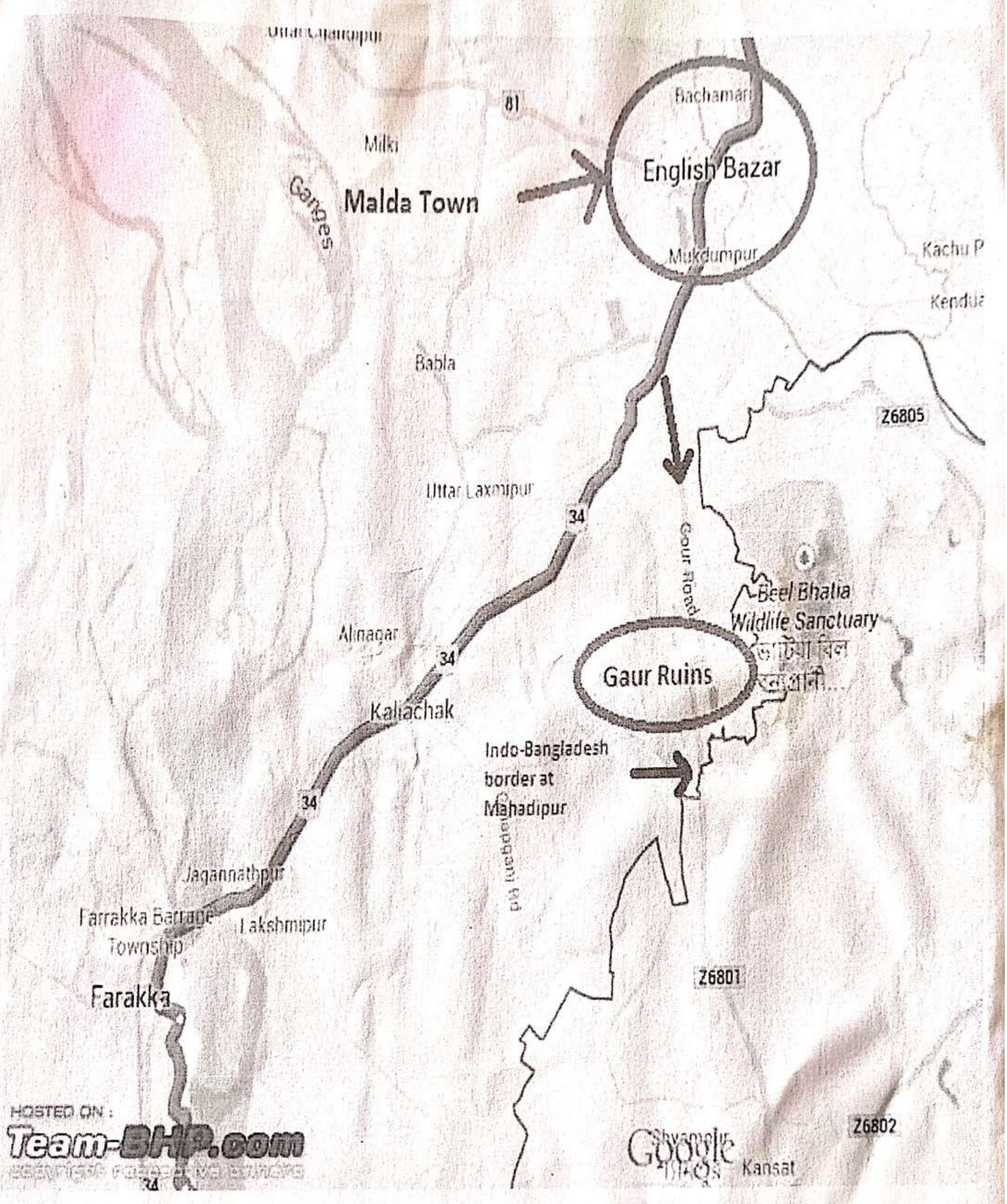

Scanned with OKEN Scanner